কাটোয়ার কলম

সংবাদ সাপ্তাহিক

কাটোয়া ■ ১১ মার্চ ২০২৩ ■ ২৬ ফাল্গুন ১৪২৯, শনিবার ■ ৪৬ বর্ষ ৩০ সংখ্যা

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে কাটোয়া শহরে শ্রমিকদের মিছিল ও পৌরসভায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাসস্ট্যাণ্ডে পথের ধারে বসে কেউ ডিম বিক্রি করেন, কেউ ফল বিক্রি করেন, কেউবা আবার জুতো সেলাই করে সংসার চালান। এই সমস্ত গরিব হকারদের গত ডিসেম্বরে পুলিশ দিয়ে উচ্ছেদ করে কাটোয়া পৌর কর্তৃপক্ষ। এরপর উচ্ছেদ হওয়া হকারদের তৃণমূল পার্টি অফিসে ডেকে বলা হয়, 'ওখানে 'উন্নয়ন' হবে, ব্যবসা করতে হলে ৪/৬ ফুট ঘরের জন্য ৮ লক্ষ টাকা দাম লাগবে, দিতে পারলে ব্যবসা করো, না হলে অন্য কেউ নেবে।' তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের এমন স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পৌরসভার দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা চলবে না— এই দাবি তুলে কাটোয়া শহর জুড়ে সি.আই.টি.ইউ-র ডাকে ৬ মার্চ শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল ও কাটোয়ার পৌরপ্রধানকে ৬ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না। উচ্ছেদ হওয়া হকারদের দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে নির্মাণ-মূল্যে ব্যবসার জন্য ঘর দিতে হবে। ট্রাফিক আইনের নাম করে পরিবহন শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি জুলুম ও অবৈধভাবে টাকা আদায় বন্ধ করতে হবে। কাটোয়া শহরে ত্রুটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের দাবি জানানো হয় শ্রমিকদের পক্ষ থেকে।

কাটোয়া শহরে শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল

পৌর প্রধানকে ডেপুটেশনের সময় শ্রমিকদের পক্ষে ছিলেন পরীক্ষিৎ রায়, জয়দীপ চ্যাটার্জী, চঞ্চল সাহা, জয়রাম বৈরাগ্য, অরিজিৎ চক্রবর্তী ও সুজিৎ রায়। পৌর প্রধান দাবিগুলি খতিয়ে দেখে আসন্ন বোর্ড মিটিং-এ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

ডেপুটেশন চলাকালীন পৌরসভা মোড়ে শ্রমিকদের সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব বর্ধমান জেলা স্ট্রিট হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাধন দাস।

মাহাচান্দায় তিন শহিদের স্মরণ-সভায় আভাস রায় চৌধুরি
অসংখ্য শহিদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই লাল ঝান্ডার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে

ভাতাড়ে তিন শহিদের স্মৃতিচারণা করছেন আভাস রায়চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৯ মার্চ ভাতাড়ের মাহাচান্দা গ্রামে তিন শহিদকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলো ভাতাড়ের মানুষ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভাতাড়-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন শহিদ মধু রায়, জগবন্ধু হাজরা, দুঃখীরাম হাজরার স্মরণে স্মৃতিচারণা করেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী, পার্টির জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ মন্ডল, সৈয়দ মহম্মদ মসীহ। এদিন রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভার কাজ শুরু হয়, তারপর শহিদ স্মরণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় মাহাচান্দা স্কুল মোড়ে।

১৯৭২ সালে এই তিন সি পি আই(এম) নেতাকে খুন করে কংগ্রেসী মদতে জোতদার-জমিদারের বাহিনী। এই অঞ্চলে ৭জন জমিদারের শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে ওঠে। জমির আন্দোলন, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষে ঐক্যবদ্ধ করে লাল

● *তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন*

ভাষায় এত মিল গোলওয়ালকার আর জিন্নার!

চন্দন দাস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 'এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা'-র ধারণা নিয়ে আলোচনার দিন। গোড়াতে তাই দু'জন আসবেন। আসবেনই গোলওয়ালকার এবং জিন্না। কারণ? এক দেশ, এক ধর্ম, এক ভাষা- গোলওয়ালকার এবং জিন্নার ভাবনায় আশ্চর্য মিল। কোনও কাঁটাতার নেই। 'পৃথক জাতি' বিশ্বাসের কোনও ছায়া সেখানে নেই। এখানে কমিউনিস্টদের কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। তাঁদের বক্তব্যেও কাঁটাতারের কোনও প্রভাব নেই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৪৭। অক্টোবর। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির চতুর্থ সম্মেলন হয়েছিল কলকাতায়। দুই বাংলার কমিউনিস্ট কর্মীদের একসঙ্গে সর্বশেষ সম্মেলন। ৮ নং ডেকার্স লেনে, পার্টির তৎকালীন অফিসের ছাদে প্যান্ডেল বেঁধে সেই সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে বলা হলো,"পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকেই সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করায় এই সম্মেলন তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সম্মেলন আশা করে যে, পূর্ববঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী অনতিবিলম্বে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবেন।"

কিন্তু তা হয়নি। আর সেই না হওয়াই হয়ে ওঠে একটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অনুঘটক।

আপাতত অবিভক্ত ভারতে হাজির হই। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মহম্মদ

● *চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন*

১০ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আহ্বানে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও ত্রিপুরায় নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, নৈরাজ্যের প্রতিবাদে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ডাকে কাটোয়া শহরে মিছিল।

৯ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সঙ্ঘ কাটোয়া ২ ব্লক কমিটির ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোলো গাজীপুর অঞ্চলের বেলেঘাটা গ্রামে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব সোমদেব মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক কিংশুক মণ্ডল। বলাই হেমরম ও জীবন কুমার দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। সম্মেলনে টুসু গান পরিবেশন করেন জয়লক্ষ্মী দাস ও সম্প্রদায়। ৩ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বলাই হেমরমকে সম্পাদক ও জীবন কুমার দাসকে সভাপতি নির্বাচিত করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

৯ মার্চ, বর্ধমান শহর : ত্রিপুরায় বিজেপি, আর.এস.এস.-এর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর ১ ও ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মিছিল।

দুধের দাওয়াত

বলেন খুড়ো

তপোময় ঘোষ

খুড়োদের গাঁয়ে ক'দিন আগে যে রক্তদান শিবির হয়েছিল খুড়ো তার ছোট ছেলে বিমলকে দিয়ে সেদিনের গরুর দেওয়া ২/৩ কেজি দুধ ওখানে পাঠিয়েছিল। কারণ খুড়ো জানে যারা রক্তদান করে তাদের এক গ্লাস গরম দুধ তখনই খাওয়াতে হয়। এই দুধ দেওয়ার জন্য খুড়োর বাড়িতে কেউ বিরক্ত হয় না বরং সবাই খুশি হয়। খুড়োর দিব্যি মনে আছে সেবার ওর বড় ছেলে অমল যেবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল সেবার ওদের ওই শিবলুন স্টেশনে ট্রেন থামানোর দাবি নিয়ে ট্রেন অবরোধ হয়েছিল। সেই অবরোধকারীদের নেতা মনে হরিপদ বিশ্বাস অর্ধেন্দু মুখার্জিরা ঘরে ঘরে মুড়ি আর দুধ সংগ্রহ করেছিল। কারণ? যে ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য দাঁড় করানো হবে তার প্যাসেঞ্জাররা তো আর আগে থেকে জানতো না যে, ট্রেন আটকানো হবে। তারা তো বিপদে পড়বেন। তাই তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।

● *তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন*

অ্যাডিনো ভাইরাসে শিশুমৃত্যু চেপে যাচ্ছে হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : করোনার মতো শিশু মৃত্যুর ঘটনাও চেপে যাচ্ছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। জ্বর, শ্বাসকষ্টে গত ১৫ দিনে কত শিশুর মৃত্যু হয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সেই তথ্য দিতে চায়নি ওয়ার্ডমাস্টার অফিস থেকে। শিশু মৃত্যুর পুরো ঘটনায় চেপে যেতে চাইছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর আগে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জ্বর, শ্বাসকষ্টে নাকি মৃত্যুর খবর তাদের কাছে নেই কিন্তু ওয়ার্ড মাস্টারের কাছে গত ১৫দিনে শিশু মৃত্যুর কোন তথ্যই মিলছে না। ঠিক করোনার মতো মৃত্যুর সংখ্যা চেপে যেতে হাসপাতালের অধ্যক্ষ শুনিয়েছেন যাদের ওজন কম, হার্টের ওষুখ আছে, বা অন্যান্য রোগ নিয়ে ভর্তি হচ্ছেন তাদের ছাড়া বাকি

● *চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন*

কাটোয়ার কলম

১১ মার্চ ■ ২০২৩

চিকিৎসার বড় অভাব

গত দু'মাসে শতাধিক শিশু মায়ের কোল খালি করে চিরকালের জন্য চলে গেল। ভাইরাসের আক্রমণে শ্বাসকষ্টে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শিশুরা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথায় বসে আছেন তিনি। নবান্নের ১৪ তলায় বসে ঘনঘন মিটিং করছেন। দু'-চারদিন অন্তর অন্তরই জারি হচ্ছে নির্দেশিকা। স্বাস্থ্যভবনের কর্তাদের মুখে কথার ফুলঝুরি। যেন কোনও সমস্যাই নেই। তুড়ি মেরে সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে হাসপাতালে হাসপাতালে হাহাকার। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ছোট ছোট শিশুরা। অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছেন বাবা-মায়েরা। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারাও প্রায় নিধিরাম সর্দার। নেই রাজ্যের বাসিন্দা। এমন রোগের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে হাতের কাছে যে পরিকাঠামো দরকার তা নেই। তাই অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ছে। চাইলেও বাঁচানো যাচ্ছে না।

অথচ মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন সব কাজই নাকি তিনি করে ফেলেছেন। যা করার কথা ছিল তার থেকেও বেশি কাজ করেছেন। জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়েছেন। কোনও জেলায় একাধিক বড় বড় অট্টালিকা হয়েছে। ঠিকাদার মোটা টাকা কামিয়েছে। কাটমানিও নেতাদের পকেটে। কিন্তু সেখানে ডাক্তার নেই, নার্স নেই, স্বাস্থ্যকর্মী নেই। নেই ন্যূনতম পরিকাঠামো। কোথাও সেই সুপার স্পেশালিটি জঙ্গলে ঢেকে গেছে। গোরু-ছাগল চরে। কোথাও কলকাতা বা বড় কোনও হাসপাতাল থেকে এক আধজন ডাক্তার সপ্তাহে দু'-একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আসেন। বাকিটা সব ঢুঢ়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ধুঁকছে, না চলার মতোই। ব্লক হাসপাতালগুলির তথৈবচ অবস্থা। গোটা রাজ্যজুড়ে হাসপাতালগুলি কোনোরকমে চালু আছে। পরিকাঠামোর অভাবে বেশিরভাগ রোগীরই চিকিৎসা করা যায় না। পাঠাতে হয় কলকাতা বা অন্য বড় হাসপাতালে। তাছাড়া ডাক্তার-নার্সের অভাবে অধিকাংশ বিভাগ বন্ধ। অনেক বিভাগ চালু করাই সম্ভব হয়নি। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

করোনার সময়ই বেরিয়ে পড়েছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হাড় ঝিরঝিরে অবস্থা। আশা করা গিয়েছিল করোনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে সাজানো হবে গোটা পরিকাঠামো। এখন বোঝা যাচ্ছে সেসব কিছুই হয়নি। কঙ্কালসার অবস্থা। তার চরম মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকে।

আসলে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনও পরিকল্পনা এই সরকারের নেই, কোনোকালে ছিলও না। স্বাস্থ্য খাতের টাকার একটা বড় অংশ ব্যয় হয় বড় বড় অট্টালিকা তৈরি, বিলাসবহুল তোরণ এবং প্রসাধনী সজ্জায়। কারণ তাতে ঠিকাদারদের উপার্জন বাড়ে এবং মোটা কাটমানিও মেলে। আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি কেনার টাকা মেলে না। ডাক্তার-নার্স সহ কর্মী নিয়োগ হয় না। অর্থাৎ বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সচেতনভাবে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে যাতে মানুষ বাধ্য হয় সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে। স্বাস্থ্য পরিষেবা বেসরকারিকরণের গতি বাড়াতেই দুর্বল করা হয় সরকারি চিকিৎসাকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে মেডিক্যালি কলেজ পর্যন্ত যদি উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা হয় তাহলে বেসরকারি হাসপাতালের গলাকাটার সুযোগ কমে যায়। সরকার তা না করে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ডের চমক সৃষ্টি করে আসলে সরকারি অর্থে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে আর চূড়ান্ত হয়রানির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকারি হাসপাতালেই যদি সেই টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দেওয়া যেত তাহলে অনেক বেশি মানুষ অনেক ভালো চিকিৎসা পেতে পারত।

সরকার সেটা চায় না। সরকারি অর্থকেই ঘুর পথে বিমা কোম্পানি ও বেসরকারি হাসপাতালের মুনাফারূপে চালান করতে চায়। আজ যদি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোয় সাজানো যায় তাহলে ৮০ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একইভাবে ধাপে ধাপে ব্লক, মহকুমা, জেলা ও মেডিক্যাল কলেজগুলিকে যদি উন্নত পরিকাঠামোর আওতায় আনা যায় তাহলে বেসরকারি হাসপাতালের দরকারই হবে না। অতি সাধারণ রোগে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হবে না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মোদী মমতা সমান দায়ী

এই অবস্থায়, বামপন্থী এবং গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। স্বৈরাচারী মোদী মমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। যে অধিকার আমরা অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে, অনেক লড়াইয়ের, তিতিক্ষার বিনিময়ে পেয়েছি, সেই বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা কোন অবস্থাতেই কেড়ে নিতে দেব না।

এই কথা গুলো শুধু মিটিং মিছিল আলোচনা সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, মোদী মমতার হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে লাগাতার এবং দুর্নিবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে, এই সরকার গুলোর ভিত নড়ে যায়। এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেই আমাদের বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

অমিত সরকারের কলমে

ভারতবর্ষের সংবিধান, আর্টিকেল ১৯ দ্বারা, ভারতীয় জনগণকে পাঁচটি মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এই অধিকারগুলি হলো : ক) বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, খ) শান্তিপূর্ণ ভাবে মানুষের জমায়েত করার স্বাধীনতা, গ) গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার ও ইউনিয়ন/ অ্যাসোশিয়েশন গড়ে তোলার স্বাধীনতা, ঘ) ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় অবাধে যাতায়াত করার স্বাধীনতা (রেস্ট্রিক্টেড জায়গা বাদ দিয়ে) এবং ঙ) ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় বসবাস করার স্বাধীনতা (আইনি নির্দেশ মেনে)।

সুতরাং, এটা সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত যে, মানুষ তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী বক্তব্য রাখতে পারবে। যদিও, একই সাথে বলা আছে যে, এমন কোন বক্তব্য রাখা যাবে না, যার মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ, প্ররোচনা মূলক বক্তব্য বাদ দিয়ে, সব কথা বলা যাবে। এই স্বাধীনতার মাধ্যমে, কেউ সরকারের কিম্বা কোন দলের বা গোষ্ঠীর অথবা ব্যক্তি বিশেষের, নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি, কর্মকাণ্ড, বিজ্ঞাপন, প্রেস কনফারেন্স, ভাষন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আলোচনা সমালোচনা মন্তব্য করতে পারে, জনমত গড়ে তুলতে পারে এবং প্রয়োজনে, গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করতে পারে। কোন আইনি বাধা নেই। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে কয়েক বার মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ হয়েছে, একথা ঠিক। একসময় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে, জরুরি অবস্থা জারি করে মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। এই রকম আরও উদাহরণ আছে। কিন্তু একথা বলা সমীচীন হবে না যে, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে কোন দিনই বাক স্বাধীনতা ছিল না। বরং, বলা যেতে পারে যে, ভারতের নাগরিক গণ মত প্রকাশের স্বাধীনতা তথা বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

কিন্তু অবস্থা বদলে গেল ২০১০ সালের পর থেকে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে অধিষ্ঠিত হলো মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে নতুন রাজ্য সরকার। ঐ সরকার এসেই, জনগণের ওপর যে সব আক্রমণ গুলো নামিয়ে নিয়ে এল, তার মধ্যে অন্যতম হলো জনগণের বাক স্বাধীনতা তথা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া। মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় এসেই বললো, বিরোধীরা দশ বছর মুখে লিওকোপ্লাস্ট লাগিয়ে রাখুন.... কোন কথা বলবেন না।

এবং শুধু মুখে বলেই ক্ষান্ত হলো না, কাজেও করে দেখাতে শুরু করলো।

এরপর এলো ২০১৪ সাল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে দক্ষিণপন্থী, উগ্র বাম বিরোধী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির সংগঠন বিজেপি, কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হলো।

আসীন হয়েই যে যে জন বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করলো, তার মধ্যে অগ্রাধিকার পেল, বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ।

তার পর থেকে, মোদী পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং মমতা পরিচালিত রাজ্য সরকার, মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করতে লাগলো। গত দশ এগারো বছরে, ভারতবর্ষের জনগণ তথা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, কিভাবে তাদের এই অধিকার হারিয়েছে বা বলা যায়, তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হলে, আস্ত একটা বই লিখতে হবে। তবে এই নিবন্ধে, কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিয়ে বাস্তব চিত্রটা দেখানোর চেষ্টা করছি।

আমরা জানি যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন, বিচার বিভাগের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা, মিডিয়ার প্রচারে হস্তক্ষেপ করা, মিছিল মিটিং সমাবেশ ইত্যাদির ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ করা, সিনেমার সেন্সর করা, নাটক প্রবন্ধ গল্প উপন্যাসের লেখক লেখিকাদের এবং দোকান ও পাবলিশার্সদের, ভয় দেখানো, ইত্যাদি ইত্যাদি এর আওতায় পড়ে।

লক্ষ্য করে দেখবেন, উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো, মোদী এবং মমতা পরিচালিত দুটো সরকারই সমানভাবে অবলম্বন করে। তার কারণ, এই দুটো দলই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক চরম প্রতিক্রিয়াশীল একটি শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

আলোচনার সুবিধার্থে, প্রথমে বিজেপি পরিচালিত সরকারের আর্টিকেল ১৯ এর উল্লঙ্ঘনের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করছি।

এক, কাপ্পান সিদ্দিকী হলেন, কেরালাবাসী একজন সাংবাদিক। ইনি হাতরাস রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেসের পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তৈরী করে জনগণকে জানিয়ে দিয়ে ছিলেন। হাতরাসে একটি কিশোরীর রেপ অ্যান্ড মার্ডার হওয়ার পরে, মোদীর প্রিয়পাত্র আদিত্য নাথ যোগী, তার পুলিশ বাহিনী দিয়ে, মেয়েটির বাড়ির লোকজন দের না জানিয়ে প্রমাণ লোপাটের জন্য, জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

এই ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছিলেন, কাপ্পান সিদ্দিকী। সেই কারণে, অর্থাৎ, সত্যকে খুঁজে বার করার জন্য, উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকার, ঐ সাংবাদিককে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরে দিয়েছিল। উনি দীর্ঘদিন বিনা অপরাধে জেল খেটে বর্তমানে রাস্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

দুই, জাতীয় কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের তথা আই টি সেলের প্রধান হলেন, পবন খেরা। ইনি একটা ভাষনে, পুঁজিপতি গৌতম আদানিকে অঢেল সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য মোদীকে ব্যাঙ্গ করে বলে ছিলেন, মোদীর প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ, নরেন্দ্র গৌতম মোদী।

এই কথা শুনে, মোদীর ভক্তরা বললো, মোদীর আসল নাম, নরেন্দ্র দামোদর মোদী (দামোদর মোদী, নরেন্দ্র মোদীর পিতা)। সেটা জেনেও, পবন খেরা মোদীর পিতাকে অপমান করেছে। ভক্তদের চিৎকার শুনে, দিল্লি থেকে রায়পুরগামী বিমানে বসে থাকা পবন খেরা কে, প্লেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে প্লেন থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে গ্রেফতার করা হলো। যদিও, এই ঘটনার অনেক আগে, পবন খেরা নিজের উক্তির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ছিলেন।

তিন, কয়েক দিন আগে, উড়িষ্যার কটক শহরে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজড়িত রেভেনসা ইউনিভার্সিটি তে, একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যান্য অনেকগুলো ফিল্মের সাথে পৃথিবী বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবিটা দেখানোর কথা ছিল। কিন্তু আর.এস.এস-এর দলবল উদ্যোক্তাদের পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল, পথের পাঁচালী ছবিটা প্রর্দশন করা যাবে না। কারণ হিসেবে দুটো পয়েন্ট উল্লেখ করে ছিল। এক, ছবিটা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে প্রমোট করেছে, এবং দুই, ছবিটার নাম ইংরেজিতে 'পথের পাঞ্চালি' লেখা হয়েছে, যার অর্থ, মহাভারতের দ্রোপদীকে (দ্রৌপদীর আর এক নাম, পাঞ্চালি) অপমান করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে হাজার ব্যাখ্যা দেওয়ার পরেও, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর লোকেরা কোন যুক্তি গ্রহণ করতে রাজি হয় নি।

ঐ একই ফেস্টিভ্যালে, অন্য আরও দুটো সিনেমার প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, ঐ সিনেমা দুটো সিনেমা, ভারতীয় সংস্কৃতির অপমান করেছে।

এবার আসা যাক, আমাদের রাজ্যের উদাহরণে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এখানেও অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উদাহরণ এক, সুদীপ্ত গুপ্ত, একজন ছাত্র নেতা--- সে শিক্ষাঙ্গনে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্রদের লড়াইয়ে পথে নেমে ছিল। মমতার পুলিশ তাকে পিটিয়ে মেরে দিয়ে ছিল।

উদাহরণ দুই, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখল করার বিরুদ্ধে, অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আনিস খান প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল। মমতার পুলিশ রাতদুপুরে তার বাড়িতে ঢুকে তাকে খুন করে দিয়ে ছিল।

উদাহরণ তিন, চাকরির দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করার উদ্দেশ্যে যুবক যুবতী দের সাথে মইদুল

● *তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন*

আলুর দাম উৎপাদন খরচের তলানিতে, গভীর সংকটে কৃষক, নির্বিকার সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : আলু পাতার সময় এক কেজি পাঞ্জাব বীজের দাম ছিল ৮০টাকা! সেই বীজ দিয়ে চাষ করে চাষী এখন মাঠে এক কেজি আলুর দাম পাচ্ছে মাত্র ৫টাকা ৭০ পয়সা থেকে ৬ টাকা। কৃষকের মাথায় হাত, কিভাবে মহাজনের দেনা শোধ হবে সংসারই বা চলবে কি করে? এই প্রকট সংকটে গ্রাম বাংলায় সরকার কোথায়? শক্তিগড়ের প্রবীণ আলু চাষী হাজি আতর আলি মন্ডল কটাক্ষ করে বলেছেন, রাজ্যের সরকারটাই জাল তাই খাস বীজ জাল, সার জাল, কীটনাশকও জাল। কৃষক চাষ করতে গিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। মহাজনের কাছে ধার করে চাষ করে সার, বীজ, কীটনাশক দিয়েও ভাল আলু হয়নি। শক্তিগড়ের মাঠে উর্বর আলু জমিতে আলু ফলেছে বিঘেতে গড়ে ৫০-৬০ বস্তা। এবার আলুর যা অবস্থা সব পুঁজি শেষ, মহাজনের দেনাতে মাথা পর্যন্ত ডুবে আছে। মাঠে আলু কেনার গরজ নেই ব্যবসাদারদের, আলু যা বিক্রি হচ্ছে গরজে।

বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে যে তথ্য হাতে এসেছে এই মুহূর্তে এক বস্তা ৫০ কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ২৪০-৩০০টাকায়। কিন্তু খোলা বাজারে আলু কিনতে গেলে ১২-১৫টাকায় সেই আলু কিনতে হচ্ছে সাধারন মানুষকে। কৃষক শেখ বাবর আলি জানিয়েছেন এ বছর এক বিঘে আলু চাষ করতে খরচ হয়েছে গড়ে ২৭-৩০ হাজার টাকা। আলুর বীজের দাম ছিল ৫০ কেজি ৪৮০০-৫০০০টাকা। যদি বিঘে পিছু গড়ে আলুর উৎপাদন ধরি ৬০-৮০ বস্তা তাহলে এক বিঘে জমির আলু বিক্রি করে কৃষক পাচ্ছে ১৮-১৯ হাজার টাকা। তাহলে ক্ষতি কত? ১০-১২ হাজার টাকা। কিভাবে বাঁচবেন কৃষক? সরকার যদি কুইন্টাল প্রতি হাজার টাকা দর দিয়ে আলু না কেনে তাহলে কৃষকের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথ খোলা নেই এমনটাই বলছেন শক্তিগড়ের আলুচাষী শেখ আসগড় আলি মন্ডল। গত বছর সরকার এক বস্তাও আলুও কেনেনি। ফলে কৃষকের যন্ত্রণার কথা কে শুনবে? হাজি আতরআলি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কৃষক বন্ধু সাজার চেষ্টা করছেন। কৃষকদের বছরে ৫ হাজার টাকা দিচ্ছে সরকার। যদিও সব কৃষক সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। চুক্তিতে যারা চাষ করেন তারা সরকারের এই হিসেব থেকে বাইরে থাকছেন। কৃষকের ফসল সরকার ন্যূনতম মূল্যে না কেনার জন্য অনেক ক্ষতি হচ্ছে চাষীর। তাই কৃষকরা দাবি করেছেন, ভিক্ষা নয়, কৃষকের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দাম দিয়ে ফসল কিনতে হবে সরকারকে। তবেই বাঁচবে কৃষক। মাঠে দাঁড়িয়ে উৎপাদিত আলুর দিকে তাকিয়ে কৃষক স্বপন দাস চোখের জল ফেলছেন, আলু ওঠার সাথে সাথে মহাজন বাড়িতে তাগাদা শুরু করেছে কিন্তু আলু বিক্রি করলে অনেক ক্ষতি যা সামলানোর মতো ক্ষমতা নেই এই চাষীর।

এখানে অনেক আলুচাষীই আক্ষেপ করেছেন শিল্পের সাথে যুক্ত উৎপাদনকারীরা তাদের নিজেদের উৎপাদিত পন্যের দাম তারা নিজেরাই ঠিক করেন। তাদের নির্ধারন করা মূল্যেই ক্রেতাকে বাজার থেকে তা কিনতে হয়। কিন্তু একমাত্র কৃষক তাঁর উৎপাদিত ফসলের দাম নিজে ঠিক করতে পারে না। তাকে ফড়ে, বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। সেই সুযোগ নিচ্ছে কর্পোরেট পুঁজি। উদাহরন দিয়ে ৭২ বছরের আতর আলি শুনিয়েছেন কৃষক সর্ষে উৎপাদন করে দাম পাচ্ছে এক কেজিতে ৪৪টাকা সেই সর্ষে কিনে আদানী তেল বিক্রি করছে ১৮০-২০০টাকা। সর্ষে, চাল, ডালের মতো খাদ্য শষ্য থেকে আদানি, আম্বানীদের চড়া দামে মুনাফা করার সুযোগ করে দিয়েছে মোদী সরকার। তেমনই নিত্যপ্রয়োজনীয় পন্য আলু যা প্রতিদিন প্রয়োজন হয় মানুষের সেই আলু চাষ করে কি কৃষক অন্যায় করেছেন? তার উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছেন না, সরকারের কৃষকের

আলুর দাম উৎপাদন খরচের তলানিতে, কৃষক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে

উৎপাদিত ফসলের প্রতি কোন দায়িত্ব নেই? একই চিত্র আমন ও বোরো ধানেও। সরকারকে ধান বিক্রি করতে না পারার ফলে ফড়ে, মহাজনরা অভাবী গরিব চাষীদের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে সেই ধানই সরকারকে বিক্রি করে মুনাফা করছে। ফলে কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঋণের জালে ফেঁসে জমি বিক্রি করেও দেনা মুক্ত হতে পারছেন না চাষীরা। পাওনাদারদের চাপে অবশেষে আত্মঘাতী হয়েছেন কয়ক শত কৃষক। ভাতার থানার মাহাচান্দা অঞ্চলের বাসুদা গ্রামের এই আত্মঘাতী কৃষকের নাম তাপস ভট্টাচার্য (৫৭)। তাঁর ভাই প্রসাদ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, গত কয়েক বছর ধরেই চাষ করে কোন লাভ হচ্ছিল না। মহাজন, ধানের আড়ত, সারের দোকান ধার ছিল, কৃষি ঋণও ছিল অনেক টাকা। তারা বাড়িতে এসে ধারের টাকা না পেয়ে গালমন্দ অসম্মান করছিল। পয়সা দিতে পারছে না ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছিল দাদা। কাউকে কিছু বলতে পারছিল না মন কষ্টে একা জীবন যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। অভিযোগ গত দশ বছরে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই শুধু আলু চাষী আত্মঘাতী হয়েছে ৬০বেশি। মেমারীর সমেশ কান্তি মন্ডল জানিয়েছেন, ২৫ বিঘে জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। আলুর এই হাল কান্না পাচ্ছে, কিভাবে শোধ করবো মহাজনের ঋণ? আলুর দাম বস্তা প্রতি ২৮০-৩০০ নামলেও কোন সরকারের হেলদোল আছে? কুকুরকে রুটি ছুঁড়ে দেবার মতো ভিক্ষে দিচ্ছে! মোদী আর দিদি। দুই সরকারের একই নীতি। কৃষকের এক বিঘে জমিতে আলুর ক্ষতি ১২ হাজার টাকা তাহলে ২৫ বিঘে জমিতে ক্ষতির পরিমার ৩লক্ষ টাকা। সরকার দিচ্ছে ৫হাজার টাকা। কিভাবে বাঁচবে কৃষক? মেমারীর টোনা গ্রামের অচিন্ত্য ঘোষও শুনিয়েছেন এক দুঃশ্চিন্তার কথা, আগামী বছরে কিভাবে চাষ করবেন? কোথায় পাবেন বীজ, সারের দাম? আলুতে ভরাডুবি হয়ে কৃষক কাঁদছে। সেই কান্না কি নবান্নের ১৪তলায় পৌঁছাচ্ছে? ভোটের আগে মোদী ও দিদি কৃষকদের জন্য কত গালভরা প্রকল্পের কথা শুনিয়েছেন এখন ভোট নেই কৃষক টের পাচ্ছেন কি সর্বনাশই না হয়েছে তাঁদের। কৃষক হরিসাধন কর্মকার, তপন পাল'রা বলেছেন সব জিনিসের দাম বাড়ছে শুধু কৃষকের উৎপাদিত ধান, পিঁয়াজ, পাট ও আলুর দাম নেই। আলুর মতো কালনা, পূর্বস্থলীর কৃষকরা একই যন্ত্রণায় ভুগছেন। মাঠে ৫-৬ টাকা কেজি পিঁয়াজ নেবার ক্রেতা নেই। ৭২ বছরের আতার আলি তাঁর সাদা দাঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছেন, আলুর ক্ষতি মেটাতে মাঠ থেকে কৃষকের কাছ থেকে ১০০০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু কেনার দাবি নিয়ে রাস্তায় নামবেন তাঁরা। পেটের দায়ে কৃষকরা জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ দেখাবে তাঁদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেয় মমতা ব্যানার্জির সরকার যদি আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে তাহলে দাবি না পূরণ হওয়া পর্যন্ত আমরা এই সরকারকে একদিনও নিশ্চিন্তেও ঘুমোতে দেবো না। লড়াই করে দাবি আদায় করবো। বর্ধমান জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সমর ঘোষ জানিয়েছেন, কৃষকদের এই চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য প্রতিরোধ ও লড়ায়ের বার্তা দিয়ে কৃষকসভা আলু চাষীদের চিঠি দিয়ে ১১মার্চ রাস্তায় নামার আহ্বান জানিয়েছে। সোমবার লড়ায়ের মেজাজ মাপতেই গ্রামে গিয়ে আলুচাষীদের হাতে হাতে ঘুরতে দেখেছি সেই চিঠি। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষকসভা মূলত ৪টি দাবিকে সামনে রেখে কৃষকদের জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছে চিঠিতে। ইতিমধ্যে গ্রামে আলোচনা হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে ৩টি কৃষি আইন আটকে গেলেও চাষী যাতে জমি ছেড়ে কর্পোরেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তার জন্য সার, বীজ, বিদ্যুৎ, কীটনাশক সব ক্ষেত্রেই ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়েছে। গত আলুর মরসুমে ১৫৬০ টাকার সার ২১০০-২২০০ টাকায় কালোবাজার থেকে কিনতে হয়েছে কৃষককে। অথচ আলু উৎপাদন হবার পর দাম তলানিতে কেন্দ্র ও রাজ্য চায়ছে কৃষক জমি থেকে সরে আসুক বড় অর্থনীতির ক্ষেত্র কৃষি ব্যবস্থা চলে যাক কর্পোরেট পুঁজির হাতে।

মাহাচান্দায় তিন শহিদের স্মরণ-সভায় আভাস রায় চৌধুরি

● *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

ঝান্ডা। প্রতিবাদী মানুষকে দমন করতেই তিন পার্টি কমরেডকে খুন করে জোতদার, জমিদারের গুন্ডাবাহিনী। সেই সময় গরিব পাড়ার একই দিনে ৩৩টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সাল থেকেই সেই বীর যোদ্ধাদের যথাযথ মর্যাদার সাথে স্মরণ করে ভাতাড়ের মানুষ।

এদিন আভাস রায়চৌধুরী বলেছেন, অসংখ্য শহিদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই লাল ঝান্ডার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে। কারো ক্ষমতা নেই লাল ঝান্ডাকে গরিব, সাধারণ মানুষের মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারে। তিনি বলেছেন, গ্রামের অর্থনীতি, গরিবের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। জনগণের পঞ্চায়েতের লক্ষ্যেই এই আইন তৈরি করেছিল বামফ্রন্ট। গরিবের হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন সেই পঞ্চায়েত চোরেদের হাতে চলে গেছে। তিনি বলেছেন, এখন চোর ছেচড়দের কথা বলতে রুচিতে বাধে আমার গোরুচোর, কয়লা চোর, কি খাচ্ছে কোথায় থাকছে তা নিয়ে মিডিয়াতে ফলাও করে দেখানো হচ্ছে। মিডিয়ার সমালোচনা করে তিনি বলেন, কর্পোরেট মিডিয়া চাইছে সারাদিন মানুষ এই গোরুচোরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। তাহলে ত্রিপুরার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, রুজি-রুটির সমস্যা ভুলিয়ে দিতে চায় ওরা।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে : মোদী মমতা সমান দায়ী

● *দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর*

মিদ্যা নবান্ন অভিযানে যাচ্ছিল। মমতার পুলিশ তাকে পিটিয়ে মেরে দিয়ে ছিল। উদাহরণ চার, মমতা ব্যানার্জী, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মেয়ের আত্মহত্যা নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছিল।

কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী কৌস্তুভ বাগচী তার জবাব দিতে গিয়ে প্রাক্তন তৃণমূলী নেতা দীপক কুমার ঘোষের লেখা একটি বই থেকে কিছু অংশ সাংবাদিকদের সামনে পড়ে শোনান। এতে না কি, মমতা ব্যানার্জীর অবমাননা করা হয়েছে। এই অজুহাতে কৌস্তুভ বাগচী কে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, মোদী মমতা একই পাঠশালার স্টুডেন্ট, একই ধ্যান ধারণার শরিক। দুজনেই, স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন এবং অসহিষ্ণু। বিরোধী মতামত কে সম্মান দেয় না, যা, গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এবং সেই কারণে, জিঘাংসা বসতঃ, বিরোধী দের বাক স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছে।

এই অবস্থায়, বামপন্থী এবং গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। স্বৈরাচারী মোদী মমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। যে অধিকার আমরা অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে, অনেক লড়াইয়ের, তিতিক্ষার বিনিময়ে পেয়েছি, সেই বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা কোন অবস্থাতেই কেড়ে নিতে দেব না। এই কথাগুলো শুধু মিটিং মিছিল আলোচনা সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না, মোদী মমতার হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে লাগাতার এবং দুর্নিবার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যাতে, এই সরকারগুলোর ভিত নড়ে যায়। এদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করেই আমাদের বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।□

দুধের দাওয়াত

● *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

খুড়ো সেদিনও তার সেভেনে পড়া ছোট ছেলে বিমলকে দিয়ে তার ঘরে কে জি ২/৩ দুধ পাঠিয়েছিল। এখনও খুড়োর মনে আছে ১৯৭০-৭২ সালের নকশাল আন্দোলন দমন করা পুলিশ অফিসার সুলতান সিং তখন কাটোয়ায় এস ডি পিও। উনি রেগে মেগে ফোর্স দিয়ে কাটোয়ার রেল কর্তাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন সেই রেল কর্তারা তো ইংরেজিতে এমন ধমক দিতে শুরু করলেন ভয়ে অবরোধকারী সব পালালেও থেকে গেলেন হাসপাতালের এক নার্সের স্বামী মিত্র বাবু। তিনি মোটামুটি ইংরেজিতেই ওই রাগী অফিসারদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন, এদের ন্যায্য দাবিগুলি। তারপর তো এখানে সেই স্টেশন হল। খুড়ো আঙুলের কর গুণে হিসাব করলেন, হ্যাঁ ঠিক ৫০ বছর হল সেই রেল অবরোধের।

সামনে HS

পরীক্ষার আগে ঝালিয়ে নাও MCQ প্রশ্ন - উত্তর

SFI এর আয়োজনে, বিশিষ্ট শিক্ষকদের দ্বারা তৈরি করা MCQ মক টেস্ট।

online

গুগল ফর্মের মাধ্যমে

রেজাল্ট মিলবে তৎক্ষণাৎ

SFI

SFI PURBA BARDDHAMAN DISTRICT COMMITTEE

Govt. of India Regn. No. 32801/77 : Postal Regn. No. BDN/32/2021-22

ভাষায় এত মিল গোলওয়ালকার আর জিন্নার!

● *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

আলি জিন্না, মুসলিম লিগ চেয়েছিল। চেয়েছিল হিন্দুত্ববাদীরাও সাভারকার, আরএসএস, মমতা ব্যানার্জির 'অটলজীর মতো অটল' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও। দুটি দেশের ভাষার প্রশ্নে তাঁদের ভাবনা কী? 'উই অর আওয়ার নেশানহুড ডিফাইনড'-এ চোখ রাখা যাক। স্বয়ংসেবকদের 'গুরুজী', দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের লেখা এই প্রবন্ধগুচ্ছ আরএসএস'র দর্শন। 'ভাষা' শিরোনামে প্রথমেই গোলওয়ালকার লিখছেন, "every Race, living in its own country evolves a language of its own, reflecting its culture, its religion, its history and traditions." অর্থাৎ — একটি জাতি, একটি দেশ, একটি সংস্কৃতি একটি ধর্ম এবং একটিই ভাষা এই সবের প্রকাশের জন্য জরুরি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে- 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান।' সঙ্ঘের দর্শন। হিন্দির কথা স্পষ্ট বলেছেন সেই গোলওয়ালকারই। এবার দেখা যাক 'বাঞ্চ অব থট'। তাঁরই লেখা। ভারতে ভাষার বিষয়ে নিজের সঙ্ঘের ভাবনা জানাতে গিয়ে গোলওয়ালকার লিখছেন, 'We have therefore to take Hindi in the interest of national unity and self-respect and not allow ourselves to swept off our feet by slogans like "Hindi imperialism" or "domination of the North" etc.'

এই পথেই স্বয়ংসেবক নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তারা দেশ গড়ে তুলতে চায়। আর এদেরকেই 'প্রকৃত দেশপ্রেমিক' মনে করেন মমতা ব্যানার্জি। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের বিভ্রান্ত করতে স্লোগান দেন 'জয় বাংলা।' আধিপত্যবাদী, অত্যাচারী, স্বৈরতান্ত্রিক দর্শন আর শাসকদের ছলের অভাব হয় না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ চাওয়া পাকিস্তানের শাসকদের ভাবনা কেমন ছিল? ১৯৪৪-র ১৭ আগস্ট গান্ধীজীকে লেখা চিঠিতে গুজরাটে জন্ম নেওয়া, বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না লিখছেন, "আমরা মনে করি ও বিশ্বাস করি যে, জাতির যে কোনও সংজ্ঞায় ও পরীক্ষায় দেখা যাইবে যে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি প্রধান জাতি। আমরা দশ কোটি মানুষের একটি জাতি। শুধু তাই নয়, জাতি হিসাবে আমাদের নিজেদের সুস্পষ্ট সৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, কারুশিল্প ও স্থপতিশিল্প, নাম ও পদবী, মূল্য ও সামঞ্জস্যের জ্ঞান, আইন ও নৈতিক নিয়ম, আচার-ব্যবহার ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, দক্ষতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা — এক কথায়, জীবন সম্বন্ধে ও জীবনের প্রতি আমাদের নিজস্ব এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে।" গোলওয়ালকারের ভাবনার সঙ্গে চমৎকার মিল! 'জাতির' ধারণার সূত্র ধরেই ভাষার ধারণাতেও সাদৃশ্য স্পষ্ট। ১৯৪৭-র ১৭মে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই মুসলিম লিগ নেতা চৌধুরি খালেকুজ্জামান ঘোষণা করেছিলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।" তাহলে প্রথমে হলো ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা জাতির ধারণা। তারপর এলো একই ভাষার ধারণা!

পাকিস্তান তৈরির সময় থেকেই এই নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, মধ্যবিত্তদের একটি অংশ এর বিরোধিতা করছিলেন। ১৯৪৮-র ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণ পরিষদে ইংরেজি, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও সমান মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ভাষণ দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৭১-এ তাঁকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী হত্যা করে। ১৯৪৮-র ১৯ মার্চ জিন্না ঢাকায় যান। ২১ মার্চ রেসকোর্সে জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে ঘোষণা করেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে শেখ মুজিবুর রহমান লিখছেন, "আমরা প্রায় চার পাঁচ শত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়। অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল, 'মানি না।" তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি যখন আবার বললেন, "উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে — তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই বসে চিৎকার করে বলল, 'না, না, না।" জিন্না প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন, তারপর বক্তৃতা করেছিলেন।" 'কায়েদ এ আজম' সোচ্চার 'না'-র মুখোমুখি হয়েছিলেন এইভাবে, 'অভিন্ন জাতির জন্য তৈরি তাঁর সাধের দেশের বয়স তখনও এক বছর হয়নি!'

১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য ঢাকার রাস্তা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছিল ছাত্র রফিকউদ্দিন, শ্রমিক আবদুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, সরকারি কর্মচারী আবদুস সামাদ প্রমুখ। সেই ঘটনা এবং তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার কথা পৃথিবী জানে। তার ইতিহাস অনেকে অনেকভাবে লিখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা হায়দর আকবর খান রনো তাঁর 'পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ'-র দ্বিতীয় খণ্ডে জানাচ্ছেন সেই দিনটির দশদিন আগে, ১৯৫২-র ১১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সার্কুলার জারি করেছিল পার্টিকর্মীদের উদ্দেশ্যে। কী ছিল তাতে? পার্টি নির্দেশ দিয়েছিল, "আন্দোলন এখনও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এখনও প্রধানত শহরে ছাত্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে।...পাকিস্তানের মজুর ও কৃষক শ্রেণি যাহাতে এই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগাইয়া আসিতে পারে, তার জন্য আমাদের পার্টির তরফ হইতে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার।" পার্টির আহ্বান ছিল জেলায় জেলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করার, ২১ ফেব্রুয়ারি গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতে হরতাল পালনের উদ্যোগ নেওয়া। ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টিকে দীর্ঘসময় আন্ডারগ্রাউন্ড থাকতে হয়েছে। পাকিস্তানের জেলে বছর পর বছর কাটাতে হয়েছে কমিউনিস্ট নেতাদের। জেলে তাঁদের গুলিতে ঝাঁঝরা হতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের আগেই, ১৯৫০-এ ২৪ এপ্রিল রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে ৭ জন কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে খুন করা হয়েছিল। ইলা মিত্র, অপর্ণা পালদের উপর পাশবিক অত্যাচারও সেই সময়ে। কারণ, কমিউনিস্ট কর্মীরা তখন হাজং বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, নাচোল সহ বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভাষা আন্দোলনের এটিও ছিল এক গৌরবোজ্বল প্রেক্ষাপট যা অনেকেই অনুচ্চারিত রাখতে চান। অনেক রাজনৈতিক দল, ইতিহাসবিদই মনে করিয়ে দিতে চান না। যে, প্রথম থেকেই ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের জমিদার, ধনী শাসক শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক মিত্র। সাম্প্রদায়িক শক্তি এমনই হয়। তাদের নাম মুসলিম লিগ হোক, অথবা বিজেপি! ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সময়েই পেশোয়ারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি হয়। ১৯৫৫-তে পাকিস্তান মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক চুক্তি (সাউথ এশিয়ান ট্রিটি অরগানাইজেশন)-র অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হতে থাকা পূর্ব বাংলার মানুষের লড়াইয়ে এই বিষয়গুলিকে যুক্ত করার কাজ কমিউনিস্টরাই করেছিল। ফলে ভাষার জন্য লড়াই যেমন জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম, তেমনই তা কৃষক-শ্রমিকের অধিকারের লড়াইয়ে সম্পৃক্ত। এবং অবশ্যই তা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অংশ। □

অ্যাডিনো ভাইরাসে শিশুমৃত্যু চেপে যাচ্ছে হাসপাতাল

● *প্রথম পৃষ্ঠার পর*

শিশুদের কোন ভয় নেই। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ১৮৬ বলে দাবি করেছেন অধ্যক্ষ কিন্তু সেই বেড'এ আরো অনেক বেশি রোগী ভর্তি আছে। একই বেডে দু'জন করে শিশু ভর্তির ফলে অন্য রোগ নিয়ে যে শিশুরা ভর্তি হয়েছে তারাও অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে! ২০০ অনেক বেশি শিশু ভর্তি থাকলেও তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ জ্বর, শ্বাস কষ্ট নিয়ে ভর্তি হচ্ছে এটা হাসপাতালের অধ্যক্ষ দাবি করেছেন। এই শিশুরা অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা তা স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগই পজিটিভ। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসার জন্য বেড বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিদিনই প্রচুর শিশু ভর্তি হচ্ছেন জ্বর, শ্বাসকষ্ট নিয়ে কিন্তু গত ১৫ দিনে কত শিশুর মৃত্যু হয়েছে সেই চিত্র স্পষ্ট করা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে প্রতিদিনের শিশু মৃত্যুর সব তথ্যই নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেই খাতা না থাকার জন্য এই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে হাসপাতালে ঘুরলে চোখে পড়বে মায়েদের কান্নার রোলে হাসপাতাল চত্বর ভারাক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন। মন্ত্রী অবশ্য শিশু মৃত্যুর খবর চেপে গিয়ে বলেছেন বর্ধমান হাসপাতালে নাকি কোন মৃত্যুর রেকর্ড নেই।

কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস

কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড

ডিটিপি'র যাবতীয় কাজ অফসেট প্রিন্টিং, জেরক্স অফসেট, সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং সহ সমস্ত ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের মহকুমায় কোনও বিকল্প নেই।

সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

ফোন ঃ ৭৩৮৪৭১২৭৬৬ ৯৪৭৪১৮১২২০

কাটোয়ার কলম ট্রাস্ট-এর পক্ষে অভেদানন্দ ঠাকুর কর্তৃক, সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে প্রকাশিত এবং কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ, সুবোধ স্মৃতি রোড (কাশীশ্বরী স্কুলের বিপরীতে), কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৭৩৮৪৭১২৭৬৬, ই-মেল ঃ katwarkalam@gmail.com

সম্পাদক ঃ দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়